गाथा-माला

Approved by the Board of Secondary Education, as a Rapid Reader for Class VII, Notification No. Syl./74/54, Calcutta Gazette 6-1-55.

গাথামাল্য

(সপ্তম শ্রেণীর দ্রুতপাঠ্য)

সম্পাদক :
শ্রীসত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ
অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
কলিকাতা

চ্যাটার্জি পাব্লিশাস
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মূল্য : সাত আনা মাত্র

EXTRA SIX PIES

প্রকাশক ঃ
অলোকা মুখোপাধ্যায়
৬২-৬, বিডন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
চ্যাটার্জি প্রিণ্টার্স
৪২এ, মলঙ্গা লেন,
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

কবিতার উপপাঠ্য পুস্তক পাঠনার প্রথা এই বৎসরই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল। মূল পাঠ্য সংকলনে যে শ্রেণীর কবিতা থাকে—উপপাঠ্য পুস্তকেও সেই শ্রেণীর কবিতা থাকিবার কথা নয় বিবেচনা করিয়া প্রধানতঃ কাহিনী-মূলক কবিতাই সংকলিত হইল—আবৃত্তির উপযোগী কয়েকটি কবিতাও শেষের দিকে সংযোজিত হইল। সূক্ষ্ম ভাবের গীতি-কবিতা বা গুরুগম্ভীর ধরণের কবিতা ইহাতে সংকলিত হইল না। ইতি

সম্পাদক

3852

সূচী

বিচারক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[ন্যায়নিষ্ঠ আদর্শ বিচারপতি রামশাস্ত্রী দেশের রাজাকেও তাঁহার অপরাধের দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত নহেন। রাজা তাঁহার বিচার মানিতে প্রস্তুত নয় বলিয়া তিনি বিচারাসন ত্যাগ করিয়া গ্রামের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন।]

পুণ্য নগরে রঘুনাথ রাও পেশোয়া নৃপতি-বংশ ;—
রাজাসনে উঠি কহিলেন বীর—
হরণ করিব ভার পৃথিবীর
মৈসুরপতি হৈদরালির দর্প করিব ধ্বংস !

দেখিতে দেখিতে পূরিয়া উঠিল সেনানী আশি সহস্র।
নানা দিকে দিকে নানা পথে পথে
মারাঠার যত গিরিদরী হ'তে
বীরগণ যেন শ্রাবণের স্রোতে ছুটিয়া আসে অজস্র।

উড়িল গগনে বিজয়পতাকা ধ্বনিল শতেক শঙ্খ।
হুলুরব করে অঙ্গনা সবে,
পুণ্য নগরী কাঁপিল গরবে,
রহিয়া রহিয়া প্রলয়-আরবে বাজে ভৈরব ডঙ্ক।

ধুলার আড়ালে ধ্বজ অরণ্যে লুকাল প্রভাত-সূর্য্য।
রক্ত-অশ্বে রঘুনাথ চলে,
আকাশ বধির জয়-কোলাহলে ;
সহসা যেন কি মন্ত্রের বলে থেমে গেল রণ-তূর্য্য।

সহসা কাহার চরণে ভূপতি জানাল পরম দৈন্য ?
সমরোন্মাদে ছুটিতে ছুটিতে
সহসা নিমেষে কার ইঙ্গিতে
সিংহদুয়ারে থামিল চকিতে আশি সহস্র সৈন্য ?

ব্রাহ্মণ আসি দাঁড়াল সমুখে ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী ।
দুই বাহু তাঁর তুলিয়া উধাও
কহিলেন ডাকি—'রঘুনাথ রাও,
নগর ছাড়িয়া কোথা চ'লে যাও না ল'য়ে পাপের শাস্তি ?'

নীরব হইল জয়-কোলাহল, নীরব সমর-বাদ্য ।
'প্রভু, কেন আজি'—কহে রঘুনাথ—
'অসময়ে পথ রুধিলে হঠাৎ,
চলেছি করিতে যবন-নিপাত যোগাতে যমের খাদ্য ।'

কহিলা শাস্ত্রী,—'বধিয়াছ তুমি আপন ভ্রাতার পুত্রে ।
বিচার তাহার না হয় য'দিন
তত কাল তুমি নহ ত স্বাধীন,
বন্দী রয়েছ অমোঘ কঠিন, ন্যায়ের বিধান-সূত্রে ।'

রুষিয়া উঠিলা রঘুনাথ রাও, কহিলা করিয়া হাস্য—
'নৃপতি কাহারো বাঁধন না মানে,
চলেছি, দীপ্ত মুক্ত কৃপাণে,
শুনিতে আসিনি পথমাঝখানে ন্যায়-বিধানের ভাষ্য ।'

কহিলা শাস্ত্রী—'রঘুনাথ রাও, যাও কর গিয়ে যুদ্ধ।
আমিও দণ্ড ছাড়িনু এবার,
ফিরিয়া চলিনু গ্রামে আপনার,
বিচারশালার খেলাঘরে আর না রহিব অবরুদ্ধ।'

বাজিল শঙ্খ, বাজিল ডঙ্ক, সেনানী ধাইল ক্ষিপ্র।
ছাড়ি দিয়া গেলা গৌরবপদ,
দূরে ফেলি দিলা সব সম্পদ্
গ্রামের কুটীরে চলি গেলা ফিরে দীন দরিদ্র বিপ্র।

পূজারিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[মগধসম্রাট অজাতশত্রুর শাসন ও নিষেধাজ্ঞা না মানিয়া নটী উপাসিকা শ্রীমতী বুদ্ধের স্মৃতি-স্তূপে দীপমালা নিবেদন করিয়া মৃত্যুবরণ করিলেন।]

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইয়া পাদ-নখ-কণা তাঁর
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ-কাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ, শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন, ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপ-পদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে কনকপ্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে, পিতার আসনে আসি,
পিতার ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে বৌদ্ধ শাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার,—ভুলিলে বিপদ্ হ'বে।"

সেদিন শারদ দিবা-অবসান,—শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্য শীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াল আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,—"এ কথা নাহি কি মনে
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা অথবা নির্ব্বাসনে!"

সেথা হ'তে ফিরি গেল চলি ধীরে বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদূর সীঁথির সীমার 'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা কাঁপি গেল তার হাত,—
কহিল,—"অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস্ পূজা, এখনি যা চ'লে,
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা-হ'লে বিষম বিপৎপাত।"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায় খোলা জানলার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী,
চমকি' উঠিল শুনি' কিঙ্কিণী চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমনি ক'রে কি মরণের পানে ছুটিয়া চলিতে আছে?"

দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী লইয়া অর্ঘ্যথালি।
"হে পুরবাসিনি", সবে ডাকি' কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়।"—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়, কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ-আলোক মিলাল নগর-সৌধ' পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজ-দেবালয় ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে অগণ্য তারা জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান"—দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি' প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপ-পদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে প্রদীপমালার মত।

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি
শুধাল,—"কে তুই ওরে দুর্ম্মতি,
মরিবার তরে করিস্ আরতি ?"
মধুর কণ্ঠে শুনিল,—"শ্রীমতী, আমি বুদ্ধের দাসী।"

সে দিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে পড়িল রক্ত-লিখা।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পদমূলে নিবিল চকিতে শেষ-আরতির শিখা।

একনাথ স্বামী

যোগীন্দ্রনাথ বসু

[মারাঠা ব্রহ্মজ্ঞানী সাধু একনাথ স্বামী স্নান করিয়া ফিরিবার পথে ধুলায় শায়িত চণ্ডালশিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং তাহার মায়ের সন্ধান করিয়া মায়ের কোলে তাহাকে সমর্পণ করিলেন।]

হেরিলেন দ্বিজবর, শিশু একজন
কাঁদিতেছে 'মা, মা' বলি, অবসন্নপ্রায়,
তপ্ত রেণুময় পথে করিয়া শয়ন ;
নাহি কেহ অভাগারে প্রবোধিতে, হায় ॥

চণ্ডাল-শিশুটি সেই জননীর সনে
প্রভাতে আসিয়াছিল গোদাবরীকূলে ;
দুঃখিনী জননী তার কাষ্ঠ-অন্বেষণে
গিয়াছিল, শোয়াইয়া রাখি তরুমূলে ॥

না হেরি মায়ের শিশু ব্যাকুল পরাণ,
উঠিয়া চলিয়াছিল খুঁজিতে মাতায়,
কোথায় জননী তার না জানে সন্ধান,
'মা, মা' বলি কাঁদি শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥

ক্রমশঃ বাড়িল বেলা, তপন-কিরণে
ধরিল সৈকত ক্রমে মূর্তি ভয়ঙ্কর,
না পারি চলিতে আর, অবসন্ন মনে,
পড়িল লুটায়ে শিশু ক্লান্ত-কলেবর ॥

ছট্‌ফট্ করে শিশু তপ্ত বালুকায়
ক্ষণেক লুটায়ে পড়ে, দাঁড়ায় আবার,
স্নান করি কত জন সেই পথে যায়,
মুখপানে চাহি কেহ নাহি দেখে তার ॥

কি জানি অশুচি তার ছায়া-পরশনে
স্নান-পূত দেহ পাছে হয় কলুষিত,
তাই কেহ দূরে তারে নিরখি নয়নে,
যাইলেন অন্যপথে, ভয়ে সঙ্কুচিত ॥

কেহ বা নিরখি তারে কোপে কম্পমান,
কহেন কর্কশ ভাষে, লক্ষ্য করি তারে
আর বুঝি, হতভাগা, মিলিল না স্থান,
মরিতে আসিলি, তাই পথের মাঝারে ?

অগ্রসরি' একনাথ মধুর বচনে
কহিলেন সম্বোধিয়া চণ্ডাল-কুমারে ;—
"উঠ, বৎস, ভয় নাই, এস মোর সনে,
কাঁদিও না, মায়ে পুনঃ পাবে দেখিবারে ॥"

অবসন্নতনু শিশু, কি দিবে উত্তর ?
ঘন-উষ্ণ-শ্বাসমাত্র করে নিক্ষেপণ ;
আঁখি-যুগে অশ্রুধারা ঝরে দর দর
জিহ্বা প্রসারিয়া করে পিপাসা জ্ঞাপন ॥

মুহূর্ত্ত চিন্তিয়া বিপ্র অতি সযতনে,
বালকে তুলিলা ক্রোড়ে প্রসারিয়া কর ;
নয়নের ধারা তার মুছিয়া বসনে,
হইলেন গৃহপানে পুনঃ অগ্রসর ॥

পরশি সে স্নিগ্ধ তনু দেহ পুলকিত,
বাহুযুগে বেড়ি শিশু ধরিল তাঁহায় ;
থামিল ক্রন্দন তার আঁখি নিমীলিত,
দূরে গেল তাপ, তার জুড়াইল কায় ॥

মলক্লেদপূর্ণ শিশু, তবুও তাহারে
ক্রোড়ে লয়ে একনাথ, তনু রোমাঞ্চিত,
হেরিলেন চণ্ডালিনী আসিছে অদূরে,
অশ্রুজলে দুঃখিনীর নয়ন প্লাবিত ॥

একি দৃশ্য ! দেশবাসী নমে যাঁর পায়,
অস্পৃশ্য চণ্ডাল-শিশু ক্রোড়দেশে তাঁর ।
চিত্রার্পিতসমা নারী ; কি বলিবে, হায় ।
লুটাইয়া পড়ি ভূমে নমে বার বার ॥

লভি হারানিধি বামা আনন্দে মগন,
ছুটে মাতৃক্রোড়ে শিশু বাহু প্রসারিয়া ।
মাতা পুত্র, একনাথ, সুখী তিনজন,
কে অধিক সুখী, সবে দেখ বিচারিয়া ॥

গুরু ও শিষ্য

রজনীকান্ত সেন

[বিষয়ী·ভক্ত শিষ্য ধনরত্নের দ্বারা গুরুভক্তি প্রকাশ করিতে চায়। নিঃস্পৃহ অনাসক্ত গুরু ভ্রান্তবুদ্ধি শিষ্যকে শিক্ষাদান করিলেন।]

গুরুগৃহে করি শাস্ত্র-পাঠ সমাপন
বন্দিয়া বণিক্-পুত্র গুরুর চরণ,
ধীরে ধীরে সবিনয়ে কহে মৃদুভাষে,
"অনুমতি হয় যদি, যাই নিজ বাসে।
কিন্তু এক ভিক্ষা আছে, চরণের দাস
সামান্য দক্ষিণা দিতে করে অভিলাষ।"
গুরু হাসি' কহে, "বৎস, দক্ষিণা কি হবে ?
আমার অভাব কিছু নাই এই ভবে !"
শিষ্য বলে, "কান্তি তব কাঞ্চনসন্নিভ,
দু'গাছি সোনার বালা পরাইব দিব।"
গুরুদেব বলে, "বৎস, তাই যদি সাধ,
দিয়ে যেও, বাসনায় না সাধিব বাদ।"
কিছুদিন পরে সেই বণিক্-নন্দন,
স্বর্ণবালা ল'য়ে করে চরণ-বন্দন।
শেষে কহে, "গুরুদেব, দু'গাছি বলয়,
হারাইয়া ফেল যদি, এই মম ভয়।"
গুরু কহে, "বৎস আমি প্রতিজ্ঞা না করি—
হারাইতে পারে, কেহ নিতে পারে হরি'।

সাধ্যমত যত্ন করি রাখিব বলয়,
তথাপি জানিও দৈব কারো বশে নয় ।”
প্রণমি বণিক-পুত্র চড়ি' নিজ রথে,
ফিরি' গেল নিজ গৃহে কাননের পথে ।

কিছুদিন পরে পুনঃ গুরু-সন্দর্শন—
অভিলাষে বনে আসে বণিক্-নন্দন
চরণে প্রণমি দেখে, দাঁড়াইয়া কাছে ;
এক হাতে বালা নাই, এক হাতে আছে ।
বিষাদে কহিল, “প্রভু, বালা কি করিলে ?”
গুরু কহে, “প'ড়ে গেছে সরসী-সলিলে ।
বণিক্-নন্দন কহে জোড় করি কর,
“সুন্দর বলয় সে যে, মূল্যও বিস্তর ।
কোন্ স্থানে পড়িয়াছে দিন্ দেখাইয়া ;
খুঁজে দেখি একবার জেলে নামাইয়া ।”
অনুরোধে যান গুরু অনিচ্ছায় ধীরে ;
উভয়ে দাঁড়ান গিয়া সরোবর-তীরে ।
শিষ্য কহে, “কোন স্থানে প'ড়েছে বলয় ?”
বাঁ-হাতের বালাগাছি খুলে গুরু কয়,
“ওই স্থানে পড়িয়াছে ।”—দেখাবার ছলে,
সে-গাছিও ছুঁড়ে ফেলে সরোবর-জলে ।
দু'গাছি বালা-ই গেল, ভাবে শিষ্য দুখে ;
দু'গাছি বালাই গেল, ভাবে গুরু সুখে ।

সিংহগড়

যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

[শিবাজীজননী বীরাঙ্গনা জিজাবাঈএর আদেশে তানাজী মালেশ্বর পুত্রের বিবাহসভা ত্যাগ করিয়া সিংহগড় জয় করিতে গেলেন। নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া তিনি দুর্গজয় করিলেন। অসাধারণ শৌর্য্যের একটি দৃষ্টান্ত।]

উমরাটিপুরে সুবেদার-গৃহে সেদিন বাজিছে বাঁশী,
তানাজীপুত্র রায়বার বিয়ে,—প্রমত্ত পুরবাসী ;
নানা আয়োজন, ভারি ধূমধাম ;
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম ;
দাঁড়াইল বর,—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি—
এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়ালো আসি'।

পাঠ করি' লিপি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,—
নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল, বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ
তারই লাগি সবে পর' নব সাজ,
সেই মিলনের শুভ লগ্নের সময় অগ্রসর !
রে বরযাত্রী ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর।'

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে পাতি' কান,
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !

অন্তঃপুরে পুরনারী যত
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত,
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত, তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান।

বারো সহস্র মাওয়ালী সৈন্য সাজিলা বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিলা তানাজী ধেয়ে ;
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়,—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?
উত্তরে শুধু কহিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
"আমি ডাকি নাই, ডেকেছেন তোমা—ভবানী মায়ের মেয়ে !"

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইয়া টানি'
কহিলা মধুর-গম্ভীর রবে,
'সিংগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজি হ'তে তোরে দ্বি ীয় পুত্র মানি।'—
তানাজীর মুখে অপূর্ব্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !

হাঁকি' পুনরায় কহে জীজাবাই,—"ছি ! ছি ! তোরা কাপুরুষ,
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ, ব্রাহ্মণ, নিষ্ঠা, আচার
ধর্ম্ম, যজ্ঞ, বিবেক-বিচার—
চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁস্—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে থু'স্ !

"তাই থাক্ তোরা লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে
থাক্ বারো মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে ;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হ'য়ে জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনাভরা লাজে—
সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে !"

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তানাজী, "তাই হবে, তাই হবে,
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জিত গৌরবে ;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরাণ সঁপি' দিব আজ মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে !"

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য চলিলা সঙ্গে ফিরে'।
সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায়
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ডঙ্গী' শৈলশিরে ;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে'।

তারপর যাহা—ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন সালে ;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত—দীপ্ত ইন্দ্রজালে।
থার্ম্মোপলির পুণ্য কাহিনী,
হল্‌দীঘাটের ধন্য বাহিনী—

অপূর্ব্ব কথা—তুলনা পাই নি তবু এর কোন কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সে দিন মহারাষ্ট্রের ভালে।

* * *

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ;
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ঙ্কর।
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী,—
"সিংগড়, মাতা, ফিরি লও আজি,
"সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে—পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর !"

লালাবাবুর দীক্ষা

কালিদাস রায়

[মনে একবিন্দুও অভিমান থাকিলে প্রকৃত বৈষ্ণব সাধক হওয়া যায় না ত্যাগবীর লালাবাবুর কঠোর সাধনার জীবন হইতে এই গাথায় তাহারই দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে।]

সিত মর্ম্মরে খচি' বিরাট দেউল রচি'
আর্ত্ত আতুর তরে খুলি' দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা, সার করি' ঝোলামালা
ভক্তগণের নামে লিখি' দানপত্র,

লালাবাবু বৈরাগী,— গুরু-করণের লাগি,'
সারা পথ ভরি' ভেট-উপহারপুঞ্জে
বাবাজী কৃষ্ণদাস যেখানে করেন বাস,
একদা এলেন সেই নিভৃত নিকুঞ্জে।
সাধুমুখে নামগান শুনিয়া জুড়াল প্রাণ
বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদ্‌বীণা-যন্ত্র।
সাধুর চরণে ধরি' ক'ন লালা, "কৃপা করি'
এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"
সাধু ক'ন স্নেহভরে "এবে ফিরে যাও ঘরে
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন রবোনাক উদাসীন।"
এত কহি' আঁখি মুদি' পুন জপে মগ্ন।
লালাবাবু যা'ন ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে
ভেট-দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায়রে তবে যশই কিনেছি ভবে,
পারের কড়ির থলি একেবারে শূন্য!
পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান-দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া,
বাহিরে তাহার রূপ মঠ, বেদী, স্তম্ভ।
যার ধন সেই পায় লোকে মোর গুণ গায়,
তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য।
ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য।"

এই ভাবি' সব ছাড়ি মন্দির, মঠ-বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্যামরাধানামে,
মাধুকরী করি' সদা ফিরেন আনন্দে।

ব্রজবাসিগণ তায় কেঁদে পিছু-পিছু ধায়,
লাখপতি ভিখ মাগে, অপরূপ দৃশ্য।
সারা ব্রজমণ্ডলে রসের ভিয়ান চলে,
সাথে সাথে ভিড় করে যত দীন নিঃস্ব।

ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালি ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে,—গৃহিণীরা ব্যস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু দৃষ্টি করিয়া নীচু,—
মুষ্টি-ভিক্ষা তরে পাতে শুধু হস্ত।

মাস-ছয় গেল, শেষে গুরুর চরণে এসে
জানালেন লালাবাবু পুন সংকল্প,
হেসে তাঁরে গুরু ক'ন, "দেরী নাই, সুলগন
নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প।"

লালাবাবু ফিরে যা'ন, ভেবে খুঁজে নাহি পা'ন,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র?
যায় কোন্ ফুটা দিয়া সবি তাঁর বাহিরিয়া
কোন্ গ্লানি জীবনের দুগ্ধে গোমূত্র?

সারা পথ আঁখি-জলে তিতাইয়া লালা চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচেনাক অন্ন,

শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি,' "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে?
এই শেঠেদের বাড়ী! রেশারেশি আড়া-তাড়ি,
চলিয়াছে কত দিন—ইহাদের সঙ্গে,
ব্রত-দান-খয়রাতে কতই এদের সাথে
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর-ডাকাডাকি ক'রে,
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত
মনের কুহর মাঝে আজো অভিমান রাজে?
হায়, আজো অধমের হ'লো নাক শিক্ষা,
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই ও দুয়ারে মাগিতে ত ভিক্ষা।"
এত ভাবি' একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু, "রাধে গোবিন্দ।"
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।
কাঁদিল প্রহরী দ্বারী— কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলি-পঙ্কে,
শেঠ্‌জী ছুটিয়া আসে বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপায়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খে।

চারিদিকে কলরোল, হরিবোল, হরিবোল,
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,
উদ্দাম কীর্ত্তনে তাণ্ডব নর্ত্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে।

শেঠ কয় জুড়ি' পাণি "আজি পরাজয় মানি
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেল বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয়-সংবাদে,
সোণা দিয়া পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"

শেঠ হাঁকে, "বার বার সারা শেঠ-ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি।"
লালাবাবু ক'ন, "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"

এক মুঠি প্রেমকণা— ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে
সবে হরি হরি বলি,' করতাল-কুতূহলী,
শেঠকুল-মহিলারা যূথী-লাজবর্ষে।

ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন গুরু এসে
কহিলেন, "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,
নেচে হরি-হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"

———

রাজ-বেশ

মোহিতলাল মজুমদার

[রাজা রাজ্যহারা হইয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়া বনবাসী হইয়াছেন। তবু তিনি বেশভূষার মায়া কাটাইতে পারিতেছেন না বলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছেন।]

রাজা গেছে বনে, গেছে তার সনে একটি সে অনুচর,
দুঃখের দিনে কেহ নাহি চিনে, সবাই হয়েছে পর।
শাল-দোশালার কিছু নাহি আর—নব নব বেশবাস,
রাজার দুলাল হয়েছে কাঙাল, এমনি সর্ব্বনাশ।
তবু তাঁর মন নহে অনুখন সেই শোকে ম্রিয়মাণ
যত বাজে বুকে তত হাসিমুখে সে ব্যথা সহিতে চান।
ফুরায়ে এসেছে আনিল যা' বেছে বসন দু' চারিখানি—
বেদনা-কাতর রাজ অনুচর প্রভু প্রয়োজন মানি'।

একদা প্রভাতে দিল তুলি হাতে যেমনি জীর্ণ বাস
রাজার বদনে ভ্রূকুটির সনে পড়িল দীর্ঘ শ্বাস।
কহিলেন ডাকি'—"আর নাই নাকি ? ফুরাইল এতদিনে ?
একি পরমাদ বসনের সাধ ঘুচিল না মানহীনে।
নিশ্চয় আছে শেষ হয় পাছে—করিতেছ সঞ্চয়,
হৃদয় আমার তাই বারবার করিতেছে অবিনয়।"
রাজার আসন ছাড়ে যেই জন বসন ছাড়িতে নারে।
ঐশ্বর্য্যের রাখে হেন জের—ভিখারী কহে ত' তারে।

এক, সব পায়,—নয়, সব যায়—উভয়ের নাই দুখ ;
রাজার মুকুটে আর জটাজূটে—ভেদ নাই এতটুক ।
গেছে রাজপাট তবু চাই ঠাট একি এ দুর্ব্বলতা ।
থাকে যদি বাকি, রাখিও না ঢাকি কহিও সত্যকথা ।”

“সোণার সূতায় লতায় পাতায় কাজ-করা আংরাখা
রাখিয়াছি প্রভু, রহিবেক তবু যতদিন যায় রাখা ।
আর কিছু নাই ; যাহা ছিল তাই সেদিন দিয়েছি দানে
তোমার আদেশে,—প্রভু, অবশেষে কি রহিবে পরিধানে ?
অধীন জনের এ ভুল মনের ক্ষমা কর মহারাজ !
শুনিনু যে কথা ঘুচিয়াছে ব্যথা, পাইয়াছি বড় লাজ ।”

রাজা কহে, “আজ ততোধিক লাজ আমি পাইয়াছি মনে,—
ওইটুকু শেষ আছে রাজ-বেশ ; তা'রি হায় প্রলোভনে
ভিক্ষুকপ্রাণ মানে অপমান করিছে কাঙালপনা ;—
দাও প'রে লই এর পরে ওই চীরবাস হ'বে সোণা ।
শয়তান মন মানিবে শাসন সব ফুরাবার পরে,
শিশুর মতন ভুলি' ক্রন্দন ঘুমাইবে অকাতরে ।”

জুতো-ছাতার জন্ম-কথা

কৃষ্ণদয়াল বসু

[মহাভারতের একটি কৌতুকাবহ উপাখ্যানকে কবি এই কবিতায় অপূর্ব্ব বাণীরূপ দান করিয়াছেন।]

পৃথিবীতে কেমন ক'রে ছাতা এবং জুতো,
জন্ম নিলে ; তোমরা তা কেউ জানো না কিচ্ছুতো ?
ভারি মজার সে ইতিহাস বলছি সবাই শোনো ;
শুনে যে খুব খুশী হবে সন্দেহ নেই কোনো।
একদা এক জষ্ঠি মাসে জমদগ্নি মুনির
হস্তে ছিল মস্ত ধনুক পৃষ্ঠে ছিল তূণীর।
কেমন কোরে চাপ্‌ল খেয়াল হঠাৎ সকালবেলায়
অমনি মুনি মেতে গেলেন তীর-ধনুকের খেলায় !

ডেকে বলেন মুনি আপন পত্নী রেণুকারে—
"তীরগুলো সব কুড়িয়ে তুমি আনবে বারে বারে।"
এই—না বোলে' মুহুর্মুহু তীর যা ছোড়েন মুনি
রেণুকা সব ছুটে গিয়ে আনেন গুনি'গুনি'।
চলছে খেলা নেইকো খেয়াল বাড়ছে বেলা কতো,
তীর-ছোড়া, তীর-কুড়িয়ে আনাই চলেছে ক্রমাগত।
আজকে মুনির বেজায় আমোদ, নেই বিরামের নাম ;
শরের পরে শর-নিক্ষেপ চল্‌ছে অবিশ্রাম !

দিগ্বিদিকে ছোড়েন মুনি বাণের পরে বাণ,
এদিকে তো মুনিপত্নীর কণ্ঠাগত প্রাণ !

মাথার 'পরে দুরন্ত রোদ, পায়ের ব্যথা দারুণ ;
তীর কুড়িয়ে আনতে হবেই, পারুন বা না পারুন।
খাঁ খাঁ করে সকল আকাশ, ফাট্‌ছে মাথার তালু,
পায়ের তলায় তেতে আগুন হ'লো পথের বালু।
ঢুলছে মাথা, টলছে শরীর, চলছে না আর চরণ,
চোখে আঁধার !—আজ রেণুকার হয় বা বুঝি মরণ।

মুনির কিন্তু ত্বর সহে না !—তিলেক দেরী হোলে
"কই রেণুকা, দেরী কেন ?" ধমকে ওঠেন বোলে'।
চম্‌কে রেণু চলেন ছুটে তীরের পিছে পিছে ;—
ক্লান্ত হোয়ে ঢোলে প'ড়লেন একটা গাছের নীচে।
ক্ষণেক পরে উঠে আবার ছুটে এলেন যেই,
এসেই দেখেন তা'তেই স্বামীর ক্রোধের সীমা নেই।
কেঁদে বল্‌লেন—"ওগো, আমার পা গিয়েছে পুড়ে ;
আর পারিনে, জ্বলে' ম'লেম দুরন্ত রোদ্দুরে !"

এত ক্ষণে চক্ষে দেখে' মুনিপত্নীর সে হাল
খেয়াল হোলো জমদগ্নির, টুট্‌লো খেলার খেয়াল।
দুঃখে রাগে মুনির তখন মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ;
ঊর্দ্ধে চেয়ে হস্তে তুলে' নিলেন ধনুঃশর !
রবির পানে চেয়ে ঋষি রেগে আগুন হোয়ে
হেঁকে বলেন—"বটে, বটে, তোমারি কাণ্ড এ !
এমনি কোরে বিশ্বভুবন জ্বালাও তুমি একাই,
স্পর্দ্ধা তোমার সয়নাকো আর—রোসো তোমায় দেখাই

"ত্রাহি, ত্রাহি !" বোলে' তখন সূর্য্য মহাবীর
মুনির কোপে প্রাণের ভয়ে কেঁপেই যে অস্থির !
মুহূর্ত্তকেই অম্‌নি তিনি মর্ত্তে নেমে এসে
ছুটে এলেন মুনির কাছে এক বামুনের বেশে।
করজোড়ে বলেন—"মুনি, বিচার তোমার কিরূপ !
হঠাৎ কেন রবির 'পরে হোলে এমন বিরূপ ?
সূর্য্য হোলেন জীবের জীবন,—কী-ই বা তাহার দোষ,—
তুমি যে তাঁর প্রাণ নিতে চাও, একি বিষম রোষ !
জ্ঞানী তুমি,—আচ্ছা আমায় তুমিই বলো দেখি
জষ্টি মাসে রোদ না হোলে ফল কিছু পাকে কি ?
আর তা-ছাড়া, সূর্য্য সে তো ছুটে বেড়ায়, মুনি,
কেমন কোরে তীরে তা'রে বিঁধবে তুমি শুনি ?"

মুনি বলেন—"যাও হে বাপু, রাখো তোমার ফাঁকি ;
তোমায় আমি ঠিক চিনেছি চল্‌বে না চালাকি।
আকাশপথে চল্‌তে তোমার যেই হবে ঠিক দু'পর,
জানি তোমায় থামতে হবে ক্ষণেক মাথার উপর,—
আমি তোমায় করবো কাণা তীর ছুড়ে তক্ষুণি !"
সূর্য্য বলেন,—"রক্ষা করো, রক্ষা করো মুনি !
আমি সূর্য্য আঁধার নাশি, আমিই নিশি পোহাই ;—
ঘা'ট হয়েছে, ক্ষমা করো,—দোহাই ঋষি, দোহাই !"
আদ্যিকালের মুনিরা সব ছিলেন মজার মানুষ
রাগের তাপের ভাপে ভরা কেবল ফাঁপা ফানুস !

পায়ের দাপে পৃথ্বী কাঁপে, যায় সে রসাতল !—
হঠাৎ কেঁদে পায়ে পড়লেই অমনি গ'লে জল !

মুনিপত্নীর দুঃখে আগুন জমদগ্নির চিতে
জ্বলছিলো যা, নিবলো রবির করুণ কাকুতিতে
"আচ্ছা, আচ্ছা, হবে হবে,"—বলেন মুনি হেসে—
আগে তোমার কাণ্ডখানা বারেক দেখ এসে !—
দেখছো না কি, ঠাকুর তোমার দারুণ রোদের ঝাঁঝে
তেতে পুড়ে মরছে আমার পত্নী রেণুকা যে !
ঘুরছে মাথা, কাঁপছে শরীর জ্বালায় জরোজরো !—
এক্ষুণি এর একটা যা হো'ক উপায়, কিছু করো !

অমনি রবি তাঁর চাদরের ভিতর হ'তে ধীরে
দু'টি জিনিস বের কোরে তা দিলেন মুনিটিরে ;—
একটি নতুন ছাতা, এবং একটি জোড়া জুতো,—
দেখে মুনি—মুনিপত্নীর ভারি মনঃপূত।
এমন বস্তু জন্মে কভু কেউ দেখেনি ভবে ;—
মুনি ভাবেন, হয়তো কোন অস্ত্রশস্ত্র হবে।
হেসে বলেন "সূয্যি ঠাকুর, শিখিয়ে দাও মোরে
অপূর্ব্ব এই অস্ত্রগুলো ছুড়বো কেমন কোরে।"

মুনির কথা শুনে' রবির ভাঙ্‌লো মনের ভয়,
কহেন হেসে—"মুনিঠাকুর, অস্ত্র এসব নয়।
'তাপ নিবারণ যন্ত্র' বরং বলতে বারণ নেই ;
এনেছিলেম যত্নে তোমার পত্নীরই জন্যেই।

এই-যে দেখছো একটি জিনিস—নামটি 'ছাতা' ইহার ;—
এমনি করে মাথায় ধোরে কোরবে রোদে বিহার !
এই দুটিকে 'জুতো' বলে—পরবে দু'টি দু'পায় ;
তপ্ত বালুর পথে চলার বিচিত্র এই উপায় !"

বোলেই হঠাৎ অন্তর্ধান কোরলেন যেই রবি,
মুনিপত্নীর দেহের জ্বালা জুড়িয়ে গেলো সবি।
পায়ের জুতো মাথার ছাতা পেলেন মনের মতন ;—
সেদিন হ'তেই চল্ হোলো এই অমূল্য দুই রতন।
একমুখে গুণ যায় না বলা এই দু'টি বস্তুর,—
রোদে জলে সমান চলে—ছাতার এ দস্তুর।
থাকলে জুতো, সকল পথেই অক্লেশে যায় হাঁটা,—
লাগবে না গায় ধূলো, এবং ফুটবে না পায় কাঁটা।

ইন্‌সাফ

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[এই কবিতায় দেখানো হইয়াছে—সুলতান গিয়াসুদ্দিন বুলবানের অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা। অত্যন্ত প্রিয় অনুগত জনকেও অপরাধ করিলে তিনি রেহাই দিতেন না।]

ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইয়া লস্কর অফুরান্
রাজ্য-পরিক্রমায় চলেন সুলতান বুল্‌বান্।
স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র, প্রতাপ-ছত্র মাথে
চলেছেন রাজা, দিল্লী-নগরী চলে যেন তাঁর সাথে।

সাথে সাথে চলে উর্দ্দু-বাজার, হাজার হাজার হাতী,
চলেছে জোয়ান পাঠ্ঠা পাঠান হাতে নিয়ে ঢাল-কাতী।
বল্লম-ধারী চলে সারি সারি, ফলায় আলোক জ্বলে,
প্রজার নালিশ শুনিয়া ফেরেন মালিক সদল বলে।
কত সাজা কত শিরোপা বিতরি' নগরে নগরে, শেষে
হাওদা নড়িল, ছাউনি পড়িল বদাউন্ পুরে এসে।
দিল্লীপতির প্রিয়পাত্র সে বদাউন-সর্দ্দার,
নগরী সাজিল নাগরীর মত ইশারায় যেন তার।

কোথাও দুঃখ নাই যেন কোনো, নাইকো নালিশ কারু,
দুলিয়া কেবল ঢালা-মখ্মল চুমকীর কাজে চারু।
ভোজে আর নাচে কুচে ও কাওয়াজে কাটে দিন মৃগয়ায় ;
লোক খাসা অতি বদাউন্-পতি সন্দেহ নাহি তায়।
বিশ্রামে বিশ্রম্ভ-আলাপে কাটে দিন কোথা দিয়ে,
রাজ-অতিথির বিদায়ের দিন ক্রমে আসে ঘনাইয়ে।
বদাউন্-বনে সে বারের মত শিকার করিয়া সারা
দঙ্গল ফেরে সুল্তান্ সহ উল্লাসে মাতোয়ারা।
সঙ্গে চলেন বদাউন্-পতি করিয়া তূর্য্যনাদ।
সহসা কে নারী উঠিল ফুকারি'—"সুল্তান্! ফরিয়াদ।"

চমকি' চাহিয়া বদাউন্-পতি বক্বক্ মিঞা কন্—
"দেওয়ানা! দেওয়ানা! হঠাও উহারে, কি দ্যাখো সিপাহিগণ!"
সুল্তান্ কন্, "না না, আনো কাছে, কি আছে নালিশ, শুনি।"
প্রমাদ গণিয়া আড়ে চায় যত ওম্রাহ বদাউনী।

গণকের ভাগ্য

শেখ হবিবর রহমন

[এই রস-রচনাটিতে ভাগ্য গণনার অসারতা দেখানো হইয়াছে।]

শাহান্ শাহের খেয়াল হোলো ভাগ্য তাহার জান্‌তে,
জবর গণক এসেছে এক সেই শহরের প্রান্তে।
হাত দেখিয়া গণেন সাধু—কে বাঁচবে কে মরবে।
গণেন ফাঁড়া, কেমন ব্যাধি কখন কারে ধরবে।
পড়ল সাড়া সারা দেশে সবাই ছুটে আস্‌ছে,
হাত গণায়ে ক্ষুণ্ণ কেহ; কেউ বা আবার হাসছে।

শুনে রাজার ইচ্ছা হ'ল ভাগ্য তাহার জান্‌তে,
মন্ত্রী গেলেন হস্তী নিয়ে গণকবরে আন্‌তে।
রাজার সভায় বস্‌ল গণক দিব্য তাহার মূর্ত্তি,
দেখে রাজার এবং সবার মনেও বড় স্ফূর্ত্তি।
সাদা তাঁহার লম্বা পোশাক দিব্য সাদা শ্মশ্রু,
ভক্তিভরে কত জনের বইল চোখে অশ্রু।
মন্ত্র প'ড়ে আকাশ পানে চাইল ক্ষণেক বৃদ্ধ,
চক্ষু মুদে রইল ক্ষণেক যেন সে বাক্‌সিদ্ধ।
সবার শেষে একটু হেসে ধরি রাজার হস্ত,
করতলের রেখাগুলি পড়্‌তে হলেন ব্যস্ত।
জিজ্ঞাসিলেন অনেক কথা পরে রাজা হর্ষে—
"বল্‌তে পারেন মরণ আমার কখন ও কোন বর্ষে?"

গণক বলেন—"অনেক দেরি—এখনো দশ বৎসর,
বাকী হুজুর, আছে আয়ুর, যদিও কাল মৎসর।"

সেই অবধি রাজার মনে নাই রে মোটে শান্তি,
শুকিয়ে গেল শরীর এবং মলিন হ'লো কান্তি।
রাজা সদাই ভাবেন ব'সে, ফেলেন দীর্ঘ নিশ্বাস।
"বলেন, মরণ কাছে এমন ছিল না মোর বিশ্বাস।"
কোন কথাই শোনেন না আর, কোন কাজেই নাই মন,
ভেবে ভেবেই হলেন সারা, ভালবাসেন নির্জ্জন।
রাজার দশা অমন হ'লে চলবে কিসে রাজ্য ?
গণ্ডগোলে বন্ধ হয়ে এলো রে রাজকার্য্য।
মন্ত্রী তখন বলেন রাজায় সেই গণকে আনতে,
'চাই আমাদের ভাগ্যে লেখা আছে কি তা জানতে।'
রাজার সভায় গণক এলেন জোড় করি তাঁর হস্ত
বলেন উজির, "একটি আমার প্রশ্ন আছে মস্ত,
ভাগ্যে আপন মৃত্যু কখন লেখা আছে স্পষ্ট,
বলুন তাহা সদয় হয়ে করুন কিছু কষ্ট।"
গণি ক্ষণেক বলেন গণক এখনো বিশ বৎসর,
আছে আমার বাকী জীবন মর্‌ব নাকো সত্বর।"
যেমন বলা, মন্ত্রীমশাই বাহির করি খড়্গ,
এক আঘাতে গণকবরে পাইয়ে দিলেন স্বর্গ।
রাজার পানে চেয়ে তখন কইল উজির বৃদ্ধ—
"দেখুন কেমন গণনা এর—কেমন সে বাক্‌সিদ্ধ।"

নারীর শক্তি

কালিদাস রায়

[নারীর অনুরোধে শূরসিংহ নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া শিরোহীর অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। শূরসিংহের প্রাণদণ্ড হইল। আবার নারীর অনুরোধেই রাজা শূরসিংহকে ক্ষমা করিলেন। সেজন্য কবিতার নাম নারীর শক্তি।]

সূর্য্যসিংহ বজ্রভীষণ করে রোষানল-বরিষণ,
গুম্ফ ফুলায়ে সিংহনিনাদে ক'রে উঠে ঘোর গর্জন—
"প্রতাপগড়ের অবমাননার
শূরসিং, তুমি কর প্রতিকার,
শিরোহীর পানে চালাও তোমার দুর্জ্জয় বীর-সেনাগণ।
রাঠোর-বংশে কন্যা সঁপিতে চাহে না যে তার অভিমান,
পদাঘাতে কর চূর্ণ তূর্ণ—নাই নাই তার আজি ত্রাণ।
বাঁধিয়া আনিবে শিরোহী-পতিরে
এ রাজ-পাদুকা বহিবে সে শিরে,
শিরোহীর শিরে বজ্র হানিতে সত্বর কর অভিযান,
বরদান যেবা করেনি গ্রহণ, করুক সে মূঢ় কর-দান।"
শূর সেনাপতি শূরসিং চলে, সাথে তার দশশত যোধ,
কেতনে তাহার লালে-লাল হ'য়ে পতপত করে রাজক্রোধ!
কালবৈশাখী ঝড়ের ধূলায়
লুটাতে বুঝি বা সুখের কুলায়
বাজা'য়ে দগড় নাকাড়া, করিল নগরদুর্গ অবরোধ।
দশশত অসিফলক ঝলকি গর্জ্জিল "চাই প্রতিশোধ।"

মেঘের মতন ছাইল গগন ঝক্‌মকি, খোলা তরবার
হ্রেষা-বৃংহণ-মন্দ্রের মাঝে রুধির ঝরিল খরধার।
যুঝিতে লাগিল ভদ্র ইতর।
পুরমহিলারা গড়ের ভিতর
আশ্রয় নিল। শিরোহীর সেনা হটে' হটে' গেল বার বার।
শোণিত-সাগরে দ্বীপসম পুরী—চারিদিকে উঠে হাহাকার।

থেমে গেছে রণ চলে লুণ্ঠন, সদ্যোবিজয়কৌতুকে,
কন্যা মেলেনি, প্রতাপগড়ের রাজকোষ ভরে যৌতুকে।
অর্জ্জুন সিং দুর্গে বন্দী
বিজয়ীর সাথে মাগিল সন্ধি,
অর্পিতে রাজী রাজনন্দনে স্নেহের দুলালী সরযূকে,
নির্জ্জিত হ'য়ে সূর্য্য-চরণে মার্জ্জনা চায় চর-মুখে।

শূর শূরসিং অবিচল আজি অসুরের মত নিষ্ঠুর,
সকল ভিক্ষা সব আবেদন তর্জ্জিয়া দেয় করি দূর!
পুরবৃদ্ধেরা পায়ে পড়ি' কাঁদি'
মুক্তির লাগি করে সাধাসাধি,
গুরু-পুরোহিত-ব্রাহ্মণ আদি শিরোহীর যত ব্যথাতুর,
প্রাণ বিপন্ন করি কৃপা মাগে; অচল অটল তবু শূর।

শিরোহীমহিষী মায়াবতী শেষে এলেন শিবিরে ঘোর রাতে;
পুরমহিলারা শত শিবিকায় সন্তানবুকে এলো পথে।
রাণী ক'ন, "শূর, মা আমি তোমার;
ভগিনীরা তব করে দরবার

বীর তুমি, রাখ নারী-মর্য্যাদা।" জল ঝরে তাঁর আঁখিপাতে।।
প্রণমি চরণে কহে শূরসিং "উত্তর দিব কালি প্রাতে।"
প্রভাতে উঠিয়া হাঁকে শূরসিং—"গুটাও শিবির, চল ফিরে,
বরযাত্রায় মিত্রের বেশে আবার ভেটিব শিরোহীরে।"
কহে যোধমল, "হায় সেনাপতি,
এ কথা কি শুনি! একি তুর্ম্মতি!
মরণ-দণ্ড অনিবার্য্য যে ছেড়ে গেলে রাজবন্দীরে!"
শূরসিং কয়, "জানি তা বন্ধু, ভেবেই ব'লেছি চল ফিরে।"

*   *   *   *

সূর্য্যসিংহ রোষে হুঙ্কারে, সভাভরা ছল ছল চোখ,
নিগড়বদ্ধ শূরসিং সেথা শুষ্ক নয়ন অপলক।
রাজা কয় "তুমি হীন নির্জ্জীব,
নারীর কাঁদনে ভুলিয়াছ, ক্লীব,
মৃত্যুদণ্ড তোমারে দিলাম।" শূর কয়, "জানি, তাই হোক।"
ফুকারিয়া কেঁদে উঠে যুবরাজ,—সভাজন সবে করে শোক।
আবার বসেছে বিচার-সভাটি, এবার মশান-চত্বরে।
সূর্য্যসিংহ ক'ন—"শূরসিং, লভিয়াছ ক্ষমা, যাও ঘরে।
আর কোনদিন নারীর বচনে
বিচলিত যেন হ'য়ো না জীবনে;
মহিষী দেছেন জীবনভিক্ষা, ঘটক-বিদায়ও এর পরে
দিবেন শীঘ্র।" শূরসিংহের চোখে অবিরল জল ঝরে।

শ্রীধর

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[জীবের মধ্যেই শিব বিরাজ করেন। জীবসেবার দ্বারা শিবকে লাভ করিবার তথ্যটি এই কবিতায় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।]

সন্ন্যাসী সাজি' শ্রীধর যেতেছে বদ্রীনাথের পথে,—
আমাদের সেই সঙ্গী শ্রীধর চিনিবে না কোন মতে।
পাঠশালে তার ছিল হাত-টান, দৃষ্টিও ছিল খর,
'নষ্টচন্দ্রে' কত ফল-মূল গোপনে করিত জড়ো।
একদা তাহার মরেছিল যবে পোষা এক শুক পাখী,
দু'দিন শ্রীধর কেঁদে ফিরেছিল বনে বনে তারে ডাকি'।
পালিত যতনে বিড়াল, কুকুর, পশুপাখী নানা জাতি,'
জানি নে ত মোরা কবে হ'তে হ'ল সাধু-ফকিরের সাথী।

ছাড়ি' যোশী-মঠ চলেছে শ্রীধর শ্রীধামের অভিমুখে,
'পরশ পাথরে' গঠিত ঠাকুর বারবার জাগে বুকে।
সিনান করিয়া মন্দিরে যবে প্রবেশে হৃষ্টমতি,
দৃষ্টি পড়িল দেবকণ্ঠের মুক্তামালার প্রতি।
স্তিমিত আলোকে হেরিয়া সে হার কুভাব জাগিল মনে;
দেখিয়া শ্রীমুখ কাঁপিল হৃদয় বাজিল মরম-কোণে!
দু'দিনের পর বিদায়ের ক্ষণে হস্তে ধরিয়া থালা,
রাওল ঠাকুর আসিলেন লয়ে সেই সে মুক্তামালা।

বলিলেন ধীরে জড়ায়ে আদরে শ্রীধরের হু'টি পাণি—
"বদ্রীনাথের পরম ভক্ত আপনি, তাহা কি জানি।
স্বপ্ন আদেশে দেবের এ মালা উপহার দিনু করে।"
—শুনিয়া শ্রীধর কাঁপিয়া উঠিল বিস্ময়ে লাজে ডরে।
কম্পিত করে মুকুতার মালা গ্রহণ করিল যবে,
পদধূলি নিতে করে কাড়াকাড়ি সাধুসন্ন্যাসী সবে।

ছল চোখে চলেছে শ্রীধর প্রতিপদে পথ টুটে,
যতনে তাহারে ধ'রে লয়ে যায় গাঢ়োয়ালী এক মুটে।
নিজের দীনতা ভাবিয়া শ্রীধর পারে না রুধিতে বারি,
লাগিতেছে আজ মুকুতার মালা পাষাণের চেয়ে ভারী।
এমনি হরির অহেতু করুণা—প্রেমের এমনি যাহু,
কয়লা-হৃদয় গলি' হীরা হয়, তস্করও হয় সাধু।
শ্রীধর তখন মুছি' আঁখি নীর বলিল, "রে মন! তবে
এখন হইতে যার মালা তার সন্ধান নিতে হবে।
সংসার ছাড়ি, এ মণির মালা কি করিবি তুই নিয়ে,
দেখা হ'লে পর তাহারে চাহিবি, তার ধন ফিরে দিয়ে।"

বরষের পর চলেছে শ্রীধর বনপথ দিয়া ধীরে,
গঙ্গোত্রীর বারি চড়াইতে রামেশ্বরের শিরে।
দেখিল সে পথে সঙ্গী জনেক পতিত নকুলে তুলি'
ক্ষত দেহে তার বুলাইছে হাত যতনে ঝাড়িছে ধূলি
তাপিত ওষ্ঠ ভিজায়ে দিতেছে কমণ্ডলুর নীরে,
তাপিত তনয়ে কাঁধে লয়ে যেন জনক চলেছে ধীরে।

কিছু দূরে গিয়া দেখে, পড়ে' আছে ডানাভাঙ্গা এক পাখী,
সন্ন্যাসী তারে কোলে তুলে' নিল, নকুলে ঝোলায় রাখি' ;
মুখে দেয় জল বুকে চেপে ধরে মুখ পানে চেয়ে কাঁদে,
ভাঙ্গা ডানা তার উত্তরী' ছিঁড়ি' সরু সূতা দিয়া বাঁধে।
পথের পাশেই সাধুর আবাস শ্রীধরে ডাকিল সেথা,
বাজিতে লাগিল শ্রীধরের প্রাণে সুদূরের কোন্ ব্যথা।
দেখিল সেখানে পদভাঙ্গা গাভী, ষণ্ড-মহিষ জরা,
পিঁজরাপোল কি আশ্রম উহা যায় না সহজে ধরা।
সজলনয়নে শ্রীধর বলিল, "ওহে সন্ন্যাসী ভায়া,
সংসার দিয়ে পশুশালা নিলে, এমনি দারুণ মায়া !"

সন্ন্যাসী বলে, "কি করি ঠাকুর, বাঁধন নাহি যে টুটে,
নীরব বেদনা আমার পরাণে সাধনা হইয়া ফুটে।
জীবের মাঝারে দেবতা পেয়েছি, বলিতে পারি না ভয়ে,
আমার চোখে যে এক হ'য়ে গেছে জীবালয়-দেবালয়ে।"
—শুনিয়া শ্রীধর বলিল তাহারে হাসি' করুণার হাসি,
"কাহার লাগিয়া হেথা পড়ে' র'বে কাহার লাগিয়া আসি' ?"
সন্ন্যাসী বলে, "মায়া-জালে আমি জড়ায়ে পড়েছি বড় ;
ভাল মনে হ'ল—ধন্য হইব এক কাজ যদি করো।
হৃষীকেশ যেতে কুড়ায়ে পেলাম একটি মুকুতা আমি,
জানি না কাহার, মরি খুঁজে খুঁজে' জানে অন্তরযামী।
শুনেছি সাধুর মালা হ'তে তাহা অজ্ঞাতে গেছে খসি',
রামেশ্বরে সে সাধু যাবে শুনি তারি লাগি' আছি বসি'।"

এত বলি' হাসি' মুকুতাটি দিল আনি' শ্রীধরের হাতে,
বলিল তাহারে, "ফিরে দিও তারে যদি দেখা হয় সাথে।"
শ্রীধর আপন মুকুতার মালা তখন বাহির করি,'
দেখিল তাহার একটি মুকুতা কেমনে গিয়াছে পড়ি'।
পুলকে সাধুর হাত দু'টি ধরি' কাঁদিয়া বলিল, "ভাই,
কেমনে আমার করিয়াছ খোঁজ, তব অসাধ্য নাই।
এ মুকুতা হারও পরের জিনিস নাম আছে তাঁর লেখা,
ধর মালা ধর, দিও মালিকেরে যদি পাও তাঁর দেখা।"

রাখি' মালাগাছি হরষে শ্রীধর চ'লে গেল নিজ কাজে,
সন্ধানী হাতে স'পিয়াছে মালা তৃপ্তি যে হিয়া-মাঝে।
জানিনে ত আমি কি করিল সাধু লয়ে সে মুকুতামালা,
হয়েছে সেখানে গ্রাম জুড়ি' এক পশু-চিকিৎসাশালা।
মূক প্রাণীদের যতন করিতে, রোগে ঔষধ দিতে,
ব্রহ্মচারীরা মগ্ন সেথায় সদা সানন্দচিতে।
দেব-বলে বলী আছে দু'টি সাধু; শুনেছি তাদের কথা—
পীড়িত পশুর গায়ে হাত দিলে, জুড়াইয়া যায় ব্যথা।
সাঁঝে দুই জনে বসি যোগাসনে স্মরিয়া জীবের জ্বালা,
মালিকের পদে ফিরে দেয় আঁখি-দ্রব-মুকুতার মালা।

নষ্টচন্দ্র

কৃষ্ণদয়াল বসু

[সঙ্গদোষে ও সঙ্গীদের ভয়ে শান্ত সুশীল ছেলেরও কিরূপ অধঃপতন হয়. এই কবিতার তাহাই দেখানো হইয়াছে।]

ইস্কুলেতে সবার সেরা চৌধুরীদের নরেন,
তাইতো সকল শিক্ষকেরা তা'রেই আদর করেন।
লেখাপড়ায় নেই কোনদিন মনোযোগের অভাব,—
দেখতে যেমন, তেম্‌নি তাহার মিষ্ট মধুর স্বভাব।
পাড়ার যত দস্যিছেলে পট্‌লা, হাবুল, গদাই—
দুষ্টামি আর নষ্টামিতেই মত্ত তা'রা সদাই।
লোকে যতোই নিন্দে করুক, যতোই মন্দ ভাবুক,
মারুক ধরুক—নেই পরোয়া—পড়ুক পিঠে চাবুক।
নরেন এদের ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলে,—কারণ
ডাংপিটেদের সঙ্গে তাহার কথা বলাই বারণ।
নিত্য নতুন ফন্দী যখন ঘুরছে এদের মাথায়,
ওর শুধু মন বন্দী তখন পড়ার পুঁথির পাতায়।
গোসাঁই বুড়ো ধনেশ খুড়োর মস্ত ফলের বাগান,
দেশবিদেশের আম লিচু জাম সেই বাগানে লাগান।
ব্যবসা চালান ফলাও রকম,—লোকটি বিষম কৃপণ,
একটিও ফল কাউকে খেতে দিবেন না তাঁর কী পণ।
পট্‌লারা সব জট্‌লা করে, রাত না হ'তে কাবার,
তাঁর বাগানের আম লিচু সব করবে গিয়ে সাবাড়,

নরেনকে সেই খবর দিয়ে হাবুল বলে, "জানিস্,
ঠক্‌তে হবে আজ আমাদের সঙ্গ যদি না নিস্।
হাড়কঞ্জুস কিপ্‌টে অমন নেইকো গাঁয়ের ভিতর,
ইতরটাকে শিক্ষা দেবোই, এতে অমত কি তোর ?
হোক্ না চতুর ধনেশ ঠাকুর, থাক্ না ঘরে কুকুর,
ভয় কিছু নেই বাগানখানার ঠিক পিছনেই পুকুর,
টপ্‌কে পাঁচিল ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সাঁতরে যাব ওপার,
ওই যেখানে পুঁই-এর মাচান আছে মাণিক-ধোপার।
ভোরবেলা যেই দেখবে আঁঠি, দেখবে কেবল খোসাই
'চাপড়ে কপাল বুক ফেটে ঠিক মরবে ধনেশ গোসাঁই।
যাবি নরেন ?—আমরা যাবোই, এসঙ্কল্প অটল !"
"না গেলে ভাগ মিলবে না ভাই !"—বললে হেঁকে পটল।
"তুই যদি যাস্, দূরে থেকেই পাবি ফলের জোগান।
'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ'—এই আমাদের শ্লোগান !"

নরেন ভাবে, "এরা যাবেই !—যদিই এদের ঠেকাই,
ফল হবে না,—ফলার হবেই, ঠকবো আমি একাই !
অহিত যা তা হবেই হবে, হবেই না তা রহিত।"
এই ভেবে সে শেষটা এসে জুটলো তাদের সহিত।
ফলার সেরে ফিরলো নরেন,—মুখটি মলিন করুণ,
গাঁয়ের বুড়ো গোসাঁই খুড়োর দারুণ ক্ষতির দরুণ।
মনখানি তা'র রইলো কি আর সেই আগেকার মতন ?
ভালো ছেলের এমনি কোরেই হয় রে অধঃপতন ॥

আক্কেল সেলামী

মোঃ গোলাম মুস্তাফা

[ইহা একটি কৌতুক-রচনা। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' নীতির একটি দৃষ্টান্ত।]

নাম ছিল তার 'আলি শাকল', বাগদাদে তার ঘর,
জাতে নাপিত, সব কাজে সে ধূর্ত্ত ভয়ঙ্কর।
চুল-দাড়ি সে খেউরি করে এমন চমৎকার—
বিরাট শহর বাগদাদে তার দোসর নাহি আর।
ওম্‌রা, আমির, উজির-নাজির, যতেক বড় লোক,
আলির হাতে খেউরি হবে—সবারি এই ঝোঁক্।
গর্ব্বে আলি বুক ফুলিয়ে চল্‌ত সকল ঠাঁই।
যা'রে—তা'রে কামায় না সে দেমাগ ভারী তাই।

একবার এক সাদাসিদে গরীব কাঠুরিয়া
গাধার পিঠে কাঠ সাজিয়ে যাচ্ছিল পথ দিয়া।
আলি তারে দেখতে পেয়ে বল্‌লে ডেকে—'এই—
গাধার পিঠে যে কাঠ আছে—সবটা যদি নেই,
কত নিবি ? ভেবে দেখে বল্ তো দেখি দাম,—
চুক্তি ছাড়া আমার কাছে নেইকো কোন কাম।'

কাঠুরিয়া বল্‌লে ভেবে—'একটি টাকা চাই।'
বল্‌লে আলি,—'একটি টাকা ? আচ্ছা, দেবো তাই।'

নামিয়ে দিল কাঠুরিয়া গাধার পিঠের ভার ;
কাঠের খাঁচা খানা শুধু রইল পিঠে তার ।
তা' দেখে কয় আলি তখন—'করলে কি ও ভাই ?—
খাঁচার যে কাঠ তা'ও যে আমার ; তোমার কিছুই নাই !
চুক্তি মোদের ভুলে গেলে ? বেশ তো মজার লোক !
"গাধার পিঠের" সব কাঠই মোর—যা'ই না কেন হোক্ ।'

কাঠুরিয়া বল্‌লে—'ভাল, তা'-ও কখনো হয় ?
কাঠের খাঁচা—সে তো আমার, বিক্রি করার নয় !
বিক্রি করার কাঠ যা,' তা'তো দিয়েই দিছি সব,
খাঁচার সাথে তার তো মোটেই নেই কোন সংস্রব ।'
বললে আলি—'ন্যাকামি নয়, ও সব এখন থাক্,—
ভাল যদি চাস্ তো, খাঁচার কাঠ নামিয়ে রাখ !'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে তখন দুঃখী কাঠুরিয়া
চ'লে গেল যে-কাঠ ছিল সবগুলোরে দিয়া ।
বাদ্‌শা তখন হারুন্—রশিদ, ন্যায়ের অবতার,
তারি কাছে গিয়ে তখন চাইল সে বিচার ।
বিচার শেষে আইন মতে আলির হ'লো জয়,
চুক্তি যা' তা' রাখতে হ'বে—মিথ্যা সে তো নয়
বাদ্‌শা তখন কাঠুরেকে ডাক্‌ল আপন-পানে,
চুপে চুপে গোপন বাণী বল্‌লে কি তা'র কানে ।
তাই শুনে সে খুশী হ'য়ে গেল আপন ঘর ।
কারো মনে খট্‌কা কিছু রইল না তারপর ।

এমনি ভাবে কেটে গেল সপ্তাহ দুই তিন,
কাঠুরিয়া আস্‌ল আলির দোকানে একদিন।
বল্‌লে—'আমি এবং আমার সঙ্গী—এ দুইজনা
তোমার হাতে খেউরী হ'তে ক'রেছি বাসনা।
গরীব মানুষ, তেমন কোন সঙ্গতি তো নাই,
কত নেবে ?—সেই কথাটা শুন্‌তে আগে চাই।'
ঘৃণাভরে বল্‌লে আলি 'দূর' বেয়াদব, দূর !
তোমার মতন লোকের মাথায় ছোঁয়াইনাক ক্ষুর
তবে যদি মাথা-পিছু এক-একটাকা দাও,
তবেই আমি খেউরী করি, নয়তো চ'লে যাও।'

কাঠুরিয়া বল্‌লে তারে—কুচ্ পরোয়া নাই !—
যা চেয়েছে খুশী মনে দিব তোমায় তা'ই।'
লাভের লোভে আলি তখন রাজী হ'লো তায় ;
বল্‌লে,—তবে এস, তোমার সঙ্গীটি কোথায় ?'
কাঠুরিয়া জবাব দিল—'আনব'খনি তারে !
সঙ্গী আমার' দাঁড়িয়ে আছে চৌরাস্তার ধারে।'
কাঠুরিয়ার চুল-দাড়ী যেই খেউরী হলো শেষ,
অমনি সে বস্ রাস্তা হ'তে কানটি ধ'রে বেশ
গাধারে ত' ক'র্‌লে হাজির, বললে হেসে—'নাও,
এই যে আমার সঙ্গী, এবার কামিয়ে এরে দাও !'
শুনেই তখন ক্রোধে আলির রইল না আর জ্ঞান—
কাঠুরিয়া কর্‌লে তাহার এম্নি অপমান !

ধাক্কা দিয়ে আলি তা'রে কর্‌লে ঘরের বা'র,
কাঠুরিয়া চল্‌ল ছুটে বাদ্‌শাহী দরবার !
খানিক পরে এলো দু'জন সিপাই অকস্মাৎ,
পাকড় ক'রে চল্‌ল নিয়ে বেঁধে আলির হাত।
বাদ্‌শা নিজে এই মামলার নিলেন বিচার-ভার,
সকল কথা শোনার পরে হুকুম হ'ল তাঁর—

'এই ব্যাপারে আলিই দোষী,—কাঠুরিয়া নয়,
চুক্তি-মত গাধারে সে কামাবে নিশ্চয় !
ক্ষুরটি নিয়ে এসো দেখি নাপিত সুচতুর,
এই খানেতে কামাও গাধার চুল-দাড়ি আর খুর !'
অপমানে ক্ষোভে আলির বাক্ সরে না আর,—
ছাড়াছাড়ি নাই তবুত—হুকুম এ বাদ্‌শার !
বাধ্য হ'য়ে ধর্‌ল সে ক্ষুর মুখ্‌টি ক'রে চুন
ভালো ছিল কেউ যদি তায় ক'রত তখন খুন্ !
কাঠুরিয়া আন্‌লে তখন সঙ্গী গাধাটিরে
হাত-পা বেঁধে শুইয়ে দিলে হাজার লোকের ভিড়ে।
আলি তখন বস্‌ল পাশে কামিয়ে দিতে তায়,
হাজার লোকের মাঝারে তা'র লজ্জাতে প্রাণ যায়।
আলি শাকল জব্দ হ'ল যার-পর-নাই, ভাই
বদ্‌মায়েসী কাজের সাজা এমনি হওয়াই চাই।

আবৃত্তি-যোগ্য কবিতা

শক্তি-ভিক্ষা

কালিদাস রায়

জয় জয় পরমেশ,
যেন—ও-নাম স্মরণে না থাকে এ মনে ধূলিমালিন্য লেশ।

তোমা পানে সদা সুপথে চলিতে শক্তি দাও,
সতত সত্য ভাবিতে বলিতে শক্তি দাও,
মিথ্যারে সদা চরণে দলিতে শক্তি দাও
মন হ'তে প্রভু ঘুচাও দ্বন্দ্ব দ্বেষ।

কুদিনে সুদিনে তোমারে পূজিতে শক্তি দাও,
চরম ইষ্ট খুঁজিতে বুঝিতে শক্তি দাও,
জীবন-সমরে সাহসে যুঝিতে শক্তি দাও,
চীরবেশই মোর হয় যেন বীরবেশ।

তব দান বলি দুঃখ সহিতে শক্তি দাও,
সকল ভ্রান্তি কলুষ দহিতে শক্তি দাও,
দেশে দেশে তব পতাকা বহিতে শক্তি দাও,
সব দেশই যেন হয় মোর নিজ দেশ।

পরের দুঃখ ব্যথায় কাঁদিতে শক্তি দাও,
সবারে মৈত্রী-বাঁধনে বাঁধিতে শক্তি দাও,
আমরণ তব ব্রতটি সাধিতে শক্তি দাও,
তোমা হ'তে সুরু তোমাতেই হোক শেষ।

[সর্ব্বধর্ম্মসম্মত প্রার্থনা]

আহ্বান

সুনির্ম্মল বসু

চল আগিয়ে ছাত্রদল।
জ্বলুক তোদের শিরায় শিরায় রক্ত তরল লাল অনল।
রুদ্র দীপক সুরযোগে তূর্য্য বাজাক্ দুর্য্যোগে,
জাগাক্ প্রাণের সূর্য্যকে টুটিয়ে মনের মেঘ-বাদল ;
চল আগিয়ে ছাত্রদল ॥

সাম্‌নে তোরা রাস্তা নে, ঝাণ্ডা উড়ুক আসমানে,
জাগ্‌বে কেন ত্রাস প্রাণে ? ঝরবে কেন অশ্রুজল ?
কিশোর তোরা সাচ্চা ভাই, নাইকো এতে বাছ-বাছাই,
গান গেয়ে যা যাচ্ছে তাই, দল্ রে কাঁটা, দল্ উপল ;
চল আগিয়ে ছাত্রদল ॥

চল্‌রে নতুন ভঙ্গীতে, জ্বল্‌রে আপন বহ্নিতে,
বল্‌রে তোরা সঙ্গীতে "আমরা নবীন বীর সকল।"
ফেল্ খুলে ফেল্ মান্ধাতার স্যাৎসেঁতে ঐ বন্ধ দ্বার,
ছাপিয়ে দিয়ে অন্ধকার—হাসবে আলোর শ্বেত-কমল ;
চল আগিয়ে ছাত্রদল ॥

মানুষ হবার গর্ব্ব ভাই, জাগুক্ মনে সর্ব্বদাই—
করবি নাকো খর্ব্ব তাই,—রইবি খাড়া থির অটল ;
আলোয় ধরা ছায় রে ছায়, সুযোগ বুঝি যায় রে যায়,
আয়রে কিশোর, আয় রে আয়, বাংলা মায়ের ভরসা-বল ;
চল আগিয়ে ছাত্রদল ॥

দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

থাক্‌ব নাক বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে' ঘুর্‌ছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন ক'রে!
কিসের নেশায় কেমন করে' মর্‌ছে বা বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় কর্‌ছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।
কেমন ক'রে বীর ডুবুরী সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপ্‌টে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ-জাহাজ চল্‌ছে ছুটি,
কেমন করে' আন্‌ছে মাণিক বোঝাই করে' সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে মথ্‌লে সাগর উথলে ওঠে জোয়ার বানে।
কেমন করে' মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চল্‌ছে হিমালয়ের চূড়ে,
তুহিন-মেরু পার হ'য়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্‌ পুরে,—
শুন্‌ব আমি ইঙ্গিত কোন্‌ মঙ্গল হ'তে আসছে উড়ে।
রইব নাক বদ্ধ খাঁচায় দেখ্‌ব এ সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারায় সাগরজলে পাহাড় চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে দশ দিকেতে পড়্‌ব লুটে,
পাতাল ফেঁড়ে নাম্‌ব নীচে উঠ্‌ব আমি আকাশ ফুঁড়ে।
বিশ্ব জগৎ দেখ্‌ব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে'।

সিংহল

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এই কবিতার চরণের প্রত্যেক মাত্রা একটী স্বরান্ত ব্যঞ্জন ও একটী হসন্তব্যঞ্জনে গঠিত। ১—৩+৩+৩+১—যার—মন্ দির্ সব্। গম্ ভীর্ তার্। বিস্-তার্ ক্রোশ। দেড়।

ওই—সিন্ধুর টিপ সিংহল দ্বীপ কাঞ্চনময় দেশ !
ওই—চন্দন যার অঙ্গের বাস, তাম্বূল-বন কেশ !
তার—উত্তাল তাল-কুঞ্জের বায় মন্থর নিশ্বাস !
আর—উজ্জ্বল তার অম্বর, আর উচ্ছল তার হাস !
ওই—শৈশব তার রাক্ষস আর যক্ষের বশ, হায়,
আর—যৌবন তার সিংহের বশ,—সিংহল নাম যা'য় ;
এই—বঙ্গের বীজ ন্যগ্রোধ-প্রায় প্রান্তর তার ছায়,
আজো—বঙ্গের বীর 'সিংহে'র নাম অন্তর তার গায় ॥
ওই—বঙ্গের শেষ কীর্ত্তির দেশ সৌরভময় ধাম !
কাঠ—শঙ্কর তার বল্কল-বাস,—সিংহল তার নাম।
তার—মন্দির সব গম্ভীর,—তার বিস্তার ক্রোশ দেড় ;
তার—পুষ্কর-মেঘ পুষ্কর্ণীর দশ ক্রোশ ঠিক বেড়।
ওই—সিংহল দ্বীপ সুন্দর শ্যাম,—নির্ম্মল তার রূপ,
তার—কণ্ঠের হার ল'ঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর—কাঞ্চন তার গৌরব আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর—সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ্ নির্ব্বাণ।

খুকুর প্রতি

কৃষ্ণদয়াল বসু

আমার কাননের যত মুকুল
খুকু—তুলে নে রাঙা হাতে তুলে নে তুই,—
এই—রঙীন ছোটো-ছোটো মালতী ফুল,
এই—আধেক ফোটো ফোটো শেফালী জুঁই।
মোর—মনের বনে যত মধু-মুকুল,
তার—তুলনা তুই, তাই তুলে নে তুই॥

আমার আকাশের পাখীর গান
খুকু—তোরি যে আধো আধো কলো-কলো।
পাখী—তুলেছে তোরি বুকে তরল তান,
তাই—সুখে যে আঁখি মোর ছলো ছলো ;
মোর—বুকের পাখী তোরে দিল কি গান।
না সে—তুমিই দিলে তারে বলো বলো।

আমার কবিতার কথা ও সুর
খুকু—আপন খুশী দিয়ে গড়ে নে তুই,—
যেন—তোমারি মাধুরীতে হ'য়ে মধুর
শুধু—তোমারি পানে চেয়ে ঝরে নিতুই।
মোর—কবিতা সুরে যদি বাজে মধুর,
তার—কবিটি আমি, আর ছবিটি তুই॥

বাণী-বন্দনা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তব আরতির পূজা উপচার সাজায়ে আজি,
অঞ্জলি ভরি এনেছি জননী কুসুমরাজি ।
এস মা কবিতামুকুতা-মালিকা কণ্ঠে পরি',
নন্দন বন তরু মর্ম্মরে শ্রবণ ভরি' ।
স্বচ্ছবিশদ উজ্জ্বল ভাষা দাও মা দাসে ।
গাঁথিব পুণ্য বাণীর মাণিক ললিত ভাষে ।
কল্পে কল্পে তব করুণার কণিকা লভি,
ধন্য হয়েছে কত অভাজন ভক্ত কবি ।
বিচিত্র বাণী করেছে রচনা অমৃতে ভরি' ।
অক্ষয় যশোময়ূখ-মুকুট গিয়াছে পরি' ।
কত অযোধ্যা ইন্দ্রপ্রস্থ ছন্দে গাঁথি',
এনেছে ধরায় বৈজয়ন্ত অরুণ ভাতি ।
সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত শিখর হ'তে,
উঠে মা তোমার বোধনমন্ত্র শ্লোকের স্রোতে ।
মনে পড়ে তীর সরস্বতীর ছায়ায় ঢাকা,
রক্ত ফলের বর্ত্তুলে ভরা বটের শাখা ।
নৈমিষ বন, হোম হুতাশন, সুরভি হবি,
বাকল বসনে ধ্যানের আসনে তাপস কবি ।

এস মা তুষার-কুন্দ-ভূষণা হে বীণাপাণি
প্রসীদ বরদে পরসাদ-রেণু দাও মা বাণী।
মার্জ্জনা কর অপরাধ মম এ আরাধনে,
এস গো জননী এস সেবকের হৃদয়াসনে।

রাবণের শোকোচ্ছ্বাস

মধুসূদন দত্ত

[দূতের মুখে যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া রাবণ বিলাপ করিতেছেন। মেঘনাদবধ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত]

(বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ ;—)
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিল কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!
কি পাপ দেখিয়া মোর রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে?

বনের মাঝারে যথা শাখাদল আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ করিছে আমারে
নিরন্তর! হ'ব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে! তা না হ'লে মরিত কি কভু
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায়, শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনক-লঙ্কা নিবিড় কাননে
পশি এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুম-দাম-সজ্জিত নাট্যশালাসম
ছিল এ সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী;
নীরব রবাব বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?

বিদুলা ও সঞ্জয়

রমণীমোহন ঘোষ

[এই কবিতার আখ্যানবস্তু মহাভারত হইতে গৃহীত। সৌবীররাজমহিষী তেজস্বিনী বিদুলা যুদ্ধে পরাভূত ভগ্নোৎসাহ পুত্র সঞ্জয়কে ধিক্কৃত করিয়া পুনরায় সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন।]

সঞ্জয়— সত্য শুনিয়াছ মাতঃ সিন্ধুরাজ সনে
রণে পরাজিত আমি।

বিদুলা— হা ধিক্, কেমনে
কহিলি একথা তুই? বহি নত শিরে
পরাভব অপমান, নিজ গৃহে ফিরে
কভু কি ক্ষত্রিয়বীর? সৌবীর-নৃপতি
জন্মদাতা পিতা তোর? ওরে মূঢ়মতি,
এরি লাগি বক্ষঃ হ'তে স্তন্যধারা দানে
লালন করিনু তোরে—এত সাবধানে
রক্ষিনু শৈশবে? বসি বিনিদ্র নয়নে
রোগশয্যাপ্রান্তে তোর উৎকণ্ঠিত মনে
কাটাইনু দীর্ঘ নিশা?

সঞ্জয়— বৃথা এ গঞ্জনা
হে জননি লাঞ্ছিতের কেন এ লাঞ্ছনা
দুঃসময়ে? সাধ করি সম্মুখ সমরে
ভঙ্গ দিয়া কোন বীর ফিরে আসে ঘরে
কলঙ্ক মাখিয়া মুখে? কিন্তু প্রতিকূল
দৈব সনে রণ মাগো সে কি নহে ভুল

শত্রুকরে সুনিশ্চিত যবে পরাজয়
তখনো সংগ্রামচেষ্টা, সে কি শুধু নয়
বাতুলতা ? ছত্রভঙ্গ চতুরঙ্গ-বল
শূন্য রাজ্যকোষ মাতঃ কি আছে সম্পদ
যুঝিতে অরাতি সনে ?

বিদুলা— ভীরু পুত্র মোর,
একি কথা তোর মুখে ? কর সুকঠোর
ক্ষাত্রধর্ম্ম আচরণ ! ওরে উঠে আয়।
কে না জানে ক্ষত্রিয়ের প্রধান সহায়
সাহস, সম্বল আর বীর্য্য আপনার,
পুরস্কার যশোমাল্য ! কে করে বিচার
কর্ত্তব্যের শেষফল তুচ্ছ লাভ ক্ষতি ?
বীরধর্ম্ম নাহি চাহে ফলাফল প্রতি।
সিন্ধুরাজ-হস্ত হ'তে বংশের গৌরব
বলে কেড়ে লও, বৎস।

সঞ্জয়— এযে অসম্ভব
সুবিশাল সিন্ধুরাজসেনা সন্ধুক্ষিত
সিন্ধুসম, জেনে শুনে বিনাশ নিশ্চিত
তবু ঝাঁপ দিব তাতে ? কর্ত্তব্য এক্ষণে
আত্মরক্ষা তরে সন্ধি।

বিদুলা— সন্ধি ? কার সনে ?
জয়োদ্ধত পররাজ্যলোভী অরাতিরে
সমুচিত দণ্ডদান না করি অচিরে

সন্ধিভিক্ষা—রাজধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে
হীন ক্ষুদ্রাশয় যেই সেই শুধু রহে
পরিতুষ্ট স্বল্প ল'য়ে গোষ্পদ যেমন
পরিপূর্ণ স্বল্পজলে। ধিক্ সেইজন
মৃত্যুভয়ে ভীত যেবা। পিতৃরাজ্য তোর
সোণার সৌবীর রাজ্য সিন্ধুবাসী চোর
ভুঞ্জিবে বঞ্চিয়া তোরে ?

সঞ্জয়— জানি চিরদিন
স্নেহময়ী মাতা মোর। কেন এ কঠিন
বাণী আজি তব মুখে ? পাষাণহৃদয়া
বিমাতা কি তুমি, মাতঃ ? বিন্দুমাত্র দয়া
নাহি কি পুত্রের তরে ?

বিদুলা— বৎস, স্নেহময়
মাতৃহৃদয়ের কি গো পূর্ণ পরিচয়
এখনও আছে বাকি ? আমি মাতা তোর
কঠিন কর্ত্তব্য বৎস তাই আজি মোর
স্বধর্ম্মরক্ষণ তোর। স্নেহে অন্ধ হয়ে
যদি মাতা নাহি দেয় পীড়িত তনয়ে
তীব্র তিক্ত মহৌষধ, সে কি শত্রু নহে ?
শোন পুত্র, পরপরাক্রম নাহি সহে
কভু যার, তারেই পুরুষ কহে সবে।
পুরুষ যে বীরকুলে—সে কোথায় কবে

হয় পরঅনুগামী ? গিয়াছিস ভুলে
কোন বংশে জন্ম তোর, পবিত্র সে কুলে
নাহি জন্মে কাপুরুষ। পশিয়া সমরে
জয়ী হ'য়ে ধন্য হ'য়ে ফিরিবি সত্বরে
সগৌরবে।

সঞ্জয়— দেহ মাতঃ পদধূলি মোরে।
উদ্ধারিব পিতৃরাজ্য সম্মুখ সমরে
নতুবা ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।
কাপুরুষ বলি খ্যাত হবে না কখন
পুত্র তব। মাতঃ, তব অমৃত বচনে
ঘুচিয়াছে অবসাদ, অন্ধ এ নয়নে
দেখিতে পেয়েছি পথ চির শ্রেয়স্কর।
লভিব উৎসাহভরে হয়ে অগ্রসর
জয় কিংবা মৃত্যুপথে অমর গৌরব।
বাঁচিব না মৃতপ্রায় সহি পরাভব।

———

নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে যা ক'রেই হোক রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল—'আহা-হা কর কি কর কি নন্দলাল!'
নন্দ বলিল—'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?'
তখন সকলে বলিল 'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।'

নন্দর ভাই কলেরায় মরে দেখিবে তাহারে কেবা?
সকলে বলিল 'যাও না নন্দ করো না ভায়ের সেবা।'
নন্দ বলিল—'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দি—
না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার ভেবে দেখি চারিদিক।'
তখন সকলে বলিল—'হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে তা বটে ঠিক।'

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন,
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশ গুণ।
খাইতে লাগিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল।
তখন সকলে বলিল, 'বাহবা বাহবা নন্দলাল।'

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দিল গালি।
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি।

ন্দ বলিল—'আ-হা-হা কর কি কর কি ছাড় না ছাই।
কি হবে দেশের গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই।
বল' ক'বিঘৎ নাকে দিব খৎ যা বল' করিব তাহা।'
তখন সকলে কহিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বাহা।'
নন্দ বাড়ির হ'ত না বাহির কোথা কি ঘটে কি জানি,
চড়িত না গাড়ী কি জানি কখন উল্টায় গাড়ীখানি।
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ রেলে কলিসন হয়,
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ীচাপা পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—'ভ্যালারে নন্দ বেঁচে থাক চিরকাল।'

হিমাচলে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জ্বলে শৈলে সূর্য্য-কিরণ-বিম্ব দলিত ছিন্ন কুজ্ঝাটি;
যেন তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ—ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জ্জটি।
ঐ সানুর সোপান-মালার উর্দ্ধে শৃঙ্গ-চরণ-রঞ্জিকা।
শোভে অভ্র-সুষমা, যেন রে শুদ্ধা গৌরকান্তি অম্বিকা।
তথা অর্দ্ধ-ধূসর ভূধর-খণ্ড দাঁড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে,
যেন নন্দীর মত রুদ্র-প্রহরী দলিছে চরণে রৌরবে;
সেথা স্তব্ধ চপল বাসনা মানসে, হত লালসার উগ্রতা,
রাজে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে তাপসীর চারু শুভ্রতা।

ঝরনা

জগৎমোহন সেন

মুক্তি লভি হর্ষে সারা উপল-পথে ঝর্‌না ধারা
উছলি পড়ে গিরির গায়ে গায়ে,
লহরীগুলি আকুলি লুটে তাদের হাসি ফেনায়ে উঠে,
নূপুরগুলি বাজিছে পায়ে পায়ে।

প্রতি প্রভাতে ভানুর কর লুটায় তার তনুর পর
সুরভি গিরি-পবন দেয় দোল।
বরষা রাখে সতেজ করি' জ্যোছনা লয় শোচনা হরি'
সিন্ধু তারে ডাকিছে উতরোল।

সে আবাহনে সরল প্রাণ গাহিয়া উঠে তরল তান,
পথের বাধা তাহাতে কিবা ভয়!
শাসন-শিলা কি দিবে পীড়া ব্রজের ডাকে সে যেন মীরা,
বেদনা তার তাও যে মধুময়।

যে শিলা তারে আঘাত হানে তারে সে হাসি' বক্ষে টানে,
শিলার বুকে লীলার গীতি উঠে,
শরমে শিলা মরমে মরি পথের পাশে রহে সে পড়ি,
চিরতরুণী ঝরনা ধারা ছুটে॥

———

জাতীয় পতাকা

মনোজিৎ বসু

তিন রঙে আঁকা জাতীয় পতাকা আজিকে তোমার প্রতি
নব-ভারতের স্বাধীন জনতা জানায় শ্রদ্ধা নতি।
অশোকচক্র লাঞ্ছিত নব তুমি যে নিশানরাজ
তব জয়গান গাহিয়া গরজে অযুত বিষাণ আজ।
প্রাসাদে কুটীরে দুর্গে কারায় গৌরবে উড্ডীন,
জানাবে বিশ্ববাসীরে, 'আমরা আর নহি পরাধীন।'
প্রাণ দিলো কত মুক্তিসাধক জাতির পতাকা তরে
মরণকালেও এ মহা-কেতন হাত হ'তে নাহি পড়ে।
স্বাধীনতা-রণে তিন রঙে রাঙা জাতীয় পতাকাখানি
মুক্তি-সেনার অন্তরে নব প্রেরণা দিয়েছ আনি।
জাতিধর্ম্মের নাহি ভেদাভেদ নাহি অপমান লাজ
এ মহানিশান জনকল্যাণ সাধিতে উড়িছ আজ।
গৈরিক কহে ত্যাগের মন্ত্র বৈরাগ্যের বাণী
সত্য-শান্তি প্রচারিল শ্বেত শ্যামলে শক্তি জানি।
অশোক-চক্র ধর্ম্ম-প্রতীক, মৈত্র-করুণা-প্রীতি
প্রচারে বিশ্বে যুগ যুগ ধরি মহামিলনের গীতি।
ভারতের নব জাতি ও শ্রেণীর ব্যবধানে মহাসেতু
ভবনে ভবনে গগনে পবনে উড়িছ জাতীয় কেতু॥
